দেশ, সমাজ ও মানবাধিকার—মানবাধিকার সনদের ঘোষনাপত্রের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে পঃ বঃ মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর রিফিউজি স্টাডিজের সহযোগিতায় আয়োজিত 'রাষ্ট্র, সমাজ ও মানবাধিকার শীর্ষক' প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

সময় ও কালের গণ্ডী অতিক্রম করে মানবজাতির জয়যাত্রা শুধু যে বস্তুগত অগ্রগতির সহায়ক পরিবেশের সূচনা করেছে তাই নয় মানুষের আত্মিক উন্নতিরও সঙ্গী হয়েছে। একটি আদর্শ সামাজিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হলে, যেখানে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং প্রতিটি নাগরিকের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার যথাযত বিকাশের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে—শান্তি, নিরাপত্তা, স্বাভাবিক অধিকার এই বিষয়সমূহকে আমাদের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক পরিকাঠামোয় সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে

মানুষের পূর্বপুরুষ অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য পরস্পর যুযুধানরত ছিল। কিন্তু সেই মানুষই আবার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে যূথবদ্ধ হয়ে সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। কাল মার্কস-এর মতে 'প্রিমিটিভ কম্যুনিজম'-এর এটাই সূচনা। তৎসত্ত্বেও মনে রাখতে হবে লর্ড অ্যাকটনের একদা সেই বিখ্যাত উক্তি ক্ষমতা দুর্নীতির জনক, অসীম ক্ষমতা জন্ম দেয় অসীম দুর্নীতির। শোষণ, নিপীড়ন ও অত্যাচারের ইতিহাস মানুষের পাশবিক ও নিষ্ঠুর স্বরূপ উন্মোচন করেছে। কিন্তু শীতের পরেই যেমন বসন্তের আগমন ঘোষিত হয়, অসহনীয় পীড়ন থেকে জন্ম নেয় তীব্র জেহাদ। ফলে, নীরব জনতার কণ্ঠস্বরই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের জন্মগত অধিকারের ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। অগণিত বিদ্রোহ, হিংসা-হানাহানির মাধ্যমেই মানুষ তার মৌলিক অধিকার লাভ করেছে। ইতিহাস একথা বলে। উদাহরণ স্বরূপ ঐতিহাসিক ১২১৫ সনের 'ইংলিশ ম্যাগনাকার্টা', মানুষের অধিকার সংক্রান্ত '১৭৮৯ সনের ফরাসী সনদ' এবং '১৭৮৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা'র কথা উল্লেখ করা যায়। নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসমষ্টি, সরকার এবং সর্বোপরি সার্বভৌমত্ব এই সব নিয়েই রাষ্ট্র হল একটি রাজনৈতিক সংঘ। আবার রাষ্ট্র হল সমাজেরই ফসল যেখানে প্রতিটি নর-নারী তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং কর্মপদ্ধতির ভিন্নতা সত্ত্বেও একটি নির্দিষ্ট প্রথা ও ঐতিহ্য মেনে চলে। বেঁচে থাকার অধিকার, বক্তব্য ও চিন্তার স্বাধীনতা এবং সমান সুযোগের অধিকার হল মানুষের অলিখিত কিন্তু সহজাত ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার। সুতরাং সমাজের প্রয়োজন তুলে ধরবে রাষ্ট্র একথা বলাই বাহুল্য।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার ইতিহাসে মানবাধিকারের ধারণাটির নিদর্শন পাওয়া যায়। তখন মানবাধিকারকে মানুষের আইন হিসেবে না ভেবে সহজাত আইন এবং ভগবানের দান হিসেবে গণ্য করা হত।

একবিংশ শতকে দুটি মারণাত্মক বিশ্বযুদ্ধের ফলে সার্বজনীন ভিত্তিতে মানবাধিকার রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

লীগ অব নেশনস্ -এর প্রতিষ্ঠা এবং ভাঙ্গন মানবাধিকার সম্ভূত পরমাদর্শগুলির বাস্তবায়িত হওয়ার পথে কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। অপরদিকে, এই সমস্যাসঙ্কুল সময়ে মানবাধিকার কেবলমাত্র রাজনৈতিক এবং নাগরিক অধিকারই নয়, মানুষের আর্থ-সামাজিক অধিকার রূপেও মূর্ত হয়ে ওঠে। এইভাবেই মানবাধিকার রক্ষার কর্তৃত্বভার রাষ্ট্রের পরিধি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ও অধিক ক্ষমতাশীল সংস্থার হাতে ন্যস্ত হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক সংস্থার মানবাধিকার রক্ষার কর্তৃত্বব্যঞ্জক ক্ষমতা কোন দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করতে পারে এই আশঙ্কা অমূলক নয়। আবার মানবাধিকারের সংজ্ঞা কি হওয়া উচিত এই নিয়ে উন্নত ও পিছিয়ে পড়া দেশসমূহের মধ্যে বারংবার বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ অনুন্নত দেশগুলি এই ধারণা পোষণ করে যে অর্থনৈতিক শোষণ এবং সম্পদ-বণ্টনের বৈষম্যের জন্যই মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা এবং নিরক্ষরতা এই দুটি বিষয়কেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিধির মধ্যে আনা হয়েছে।

কিন্তু বহু ব্যাখ্যাকার মানবাধিকারের ভূমিকাকে খাটো করে দেখেছেন যেহেতু কোন সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতি বা কৃষ্টিই স্থির করে সেই সমাজের নৈতিক মানদণ্ড কিরূপ হওয়া উচিত। তবে এই ব্যাখ্যা সত্যি বলে মানলে হিটলার, ইদি আমিন, সাদ্দাম হুসেন প্রমুখ স্বৈরতান্ত্রিক শাসকদের নিন্দা করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ দমন পীড়নের ফলেই জনগণ এইসব অত্যাচারী শাসকদের মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ উৎপীড়ক শাসকের হাতে সব কালেই একটা অস্ত্র। আবার যদিও প্রতিটি সমাজের নৈতিকতার মান ভিন্ন, কিন্তু নৈতিক আইন সর্বদাই আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে হাত ধরে চলে।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। কয়েকবছর পূর্বে সিঙ্গাপুরে মাইকেল ফে নামক একজন তরুণ মার্কিন পর্যটককে গাড়ী ভাঙ্গচুর করার দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে তাকে বেত্রাঘাত করার আদেশ দেওয়া হয়। এই ঘটনায় পশ্চিমি দুনিয়ায় আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কারণ নিজের দেশে এই একই অপরাধে তার শাস্তি আরো লঘু হত। অতএব পাশ্চাত্যের দেশগুলির সাথে এশীয় দেশসমূহের মানবাধিকার নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। দেখা গেল, পাশ্চাত্যের দুনিয়া ব্যক্তি ও তার অধিকারকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেয়, অপরদিকে এশীয় দেশগুলিতে ব্যক্তির ইচ্ছাকে প্রাধান্য না দিয়ে সমাজের সার্বিক হিতাহিতের কথা ভাবা হয়। অধিক প্রগতিশীল মূল্যবোধ গড়ে তুলতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই ফারাককে ঘুচিয়ে ফেলার চেষ্টা চলছে। ভারতবর্ষ কেন শ্রীলঙ্কা, বলকান রাজ্যসমূহ বা রোয়াণ্ডা প্রভৃতি ক্ষুদ্র দেশের মানবাধিকার লংঘন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত এই প্রশ্ন আমরা নিজেদের করতে পারি। উত্তর হল পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই মনে করে মানবাধিকার এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের ভিতর সংঘাতের ঘটনায় সর্বাধিক মানবাধিকার লংঘিত হয়। মানুষের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি-ভঙ্গীর ফলেই বিশ্বের অধিকাংশ সমস্যাজড়িত স্থানে গণহত্যা এবং জাতিগত দাঙ্গা সংঘটিত হয় এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে মানুষে মানুষে অলীক বিভেদ সৃষ্টি হয়। অধিকন্তু, অন্য দেশের মানবাধিকার লংঘনের ঘটনায় ভারতের চিন্তা, বেশী এই যুক্তি যদিও গ্রাহ্য নয়, ভারত তার ঔপনিবেশিক সত্ত্বা ও বিশিষ্টতার কারণে মানুষের মর্যাদা রক্ষার এই বিষয়টি এড়িয়ে যেতে পারে না। এছাড়া কোন দেশের বিদেশ নীতির সাথে মানবাধিকার উন্নয়নের কোনরূপ বৈরিতা নেই। পরন্তু, মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার প্রতি সমগ্র বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণের মাধ্যমে কোন দেশ মানবজাতির উৎকর্ষতাকেই তুলে ধরে যা কিনা সকল দেশ ও জাতির মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ়তর করে।

ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে সংবিধান প্রণেতাগণ রাষ্ট্রসঙ্ঘের ১৯৪৮ সালের 'মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণায় অনুপ্রাণিত হয়ে সংবিধানের ৩য় অধ্যায়ে ১৩ নং অনুচ্ছেদ থেকে ৩২ নং অনুচ্ছেদে কিছু মৌলিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বস্তুতপক্ষে, ভারত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার অন্যতম সদস্য হিসেবে উপরোক্ত ঘোষণার রচনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল

ভারতের সংবিধানের 'প্রস্তাবনা' অংশে ব্যক্তির মর্যাদা বিষয়টি সূচিত করার মাধ্যমে মৌলিক অধিকার সমূহের গুরুত্ব ঘোষিত হয়েছে। রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক সাম্যের মাধ্যমে এই অধিকারগুলি সমৃদ্ধ হয় এবং সুবিচার, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের মধ্যে দিয়ে সুদৃঢ় হয়। বিচারপতি শ্রী ভগবতী এই মৌলিক অধিকারগুলির ভূমিকা সম্পর্কে আরো সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন—এই অধিকারগুলি মানুষ সযত্নে লালন করে কারণ তা ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষা করে এবং মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে।

কিন্তু পরের অধিকার বিপন্ন করে মানুষ যাতে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করতে না পারে সেইজন্য সংবিধানভূত এই মৌলিক অধিকারগুলির কিছু যুক্তিসঙ্গত সীমাবদ্ধতা আছে। নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিধি মেনে যা ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করা এবং সমাজের স্থায়িত্ব এবং ঐক্য বজায় রাখা—এই দুইটি বিষয়কে পাশাপাশি চলতে সাহায্য করে।

ভারতীয় সংবিধানে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে অথবা অন্যান্য আন্তর্জাতিক কভেন্যান্ট-এ খচিত আদর্শ সমূহ কখনই পুরোপুরি কার্যকরী করা হয় নি। বলা হয়েছে, কেবলমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তিই স্বাধীন। সমাজে মানবাধিকার সম্পর্কে অজ্ঞতা হেতু নাগরিকের অধিকারে রাশ টানা হয়। মানবাধিকারকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়—অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এই শিক্ষা পেয়েছি। দুর্ভাগ্যক্রমে, মানবাধিকার বিষয়টি এক শ্রেণীর মানুষের নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা নিজেদের প্রয়োজনে তাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে আবার কখনও সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগে